॥ নির্বাচিত সময়কালের মধ্যে জনপ্রতিনিধিদের দলবদলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন ॥*

মনুষ্য সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়াকে নিয়ে যে সমস্ত মহান দার্শনিক তাঁদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন যথাক্রমে হবস্, লক্ এবং রুশো প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে মানুষ সংঘবদ্ধ সামাজিক প্রাণী । মানব সভ্যতার ইতিহাসকে যিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন সেই মহামতি কার্ল মার্ক্সও মানুষকে সংঘবদ্ধ সামাজিক প্রাণী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন । সংঘবদ্ধতা ও দল বা গোষ্ঠি তৈরি করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি । এই প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং অধুনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মানুষের সংঘবদ্ধতার নব রূপায়ন ।

আমাদের দেশের মহাকাব্য, যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতেও সুনির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠির আত্মপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় । এমনকি ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বিবেচনার মধ্য দিয়ে দলবদলের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় । যেমন বিভীষণ নীতির প্রশ্নে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের দলে যোগ দিয়েছিলেন । মহাভারতেও যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে যুধিষ্ঠির তাঁর দলের এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের কাছে আবেদন করে বলেছিলেন, যদি কেউ দলবদল করতে চান, তাঁর আপত্তি নেই ।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলের জন্ম বৃটিশ শাসনকালে এবং স্বাধীনতার আগে একটি রাজনৈতিক দল থেকে আদর্শগত কারণে বা সেই রাজনৈতিক দল অনুসৃত নীতির সমালোচনা করে অন্য দল গঠন করার অন্যতম উদাহরণ কংগ্রেস নির্বাচিত সভাপতি দেশবরেণ্য সুভাষচন্দ্র বসু দলত্যাগ করে নতুন একটি দল গঠন করেছিলেন যার নাম "ফরোয়ার্ড ব্লক"। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী "যুগান্তর" ও "অনুশীলন সমিতি" গোষ্ঠির বহু স্বাধীনতা যোদ্ধারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন আবার অনেকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের শরিক হন । চট্টগাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম সেনানী শ্রী গণেশ ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচিত প্রতিনিধি হন । এই জাতীয় মতাদর্শগত কারণে দলবদলের সিদ্ধান্ত কখনোই জনসমক্ষে বা জনমানসে কোনোরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি এবং কখনোই মনে হয়নি এই ধরণের নীতিগত কারণে দলবদল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অশনিসংকেত ।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে দল গঠন করা ও দলের হয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব করা মানুষের মৌলিক অধিকার । ভারতের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান এবং সংবিধানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে এবং এই স্বাধীনতার সূত্র ধরে রাজনৈতিক দল গঠন করা বা রাজনৈতিক দলে যুক্ত হওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার । এই মৌলিক অধিকারকে মান্যতা দিতেই ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক কাঠামো, যার মাধ্যমে মানুষের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় লোকসভা, রাজ্যের বিধানসভা এমনকি বিভিন্ন পৌরসংস্থা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা । প্রত্যেকটি নির্বাচনেই যথাক্রমে লোকসভা থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে । ভারতবর্ষের নাগরিকরা ভোটদান করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক মতাদর্শকে ভিত্তি করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেন । নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যে মতাদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচিত হন এবং তাঁকে যাঁরা ভোটদান করেন তাঁরা প্রত্যেকেই সম মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ । কিন্তু ভারতীয় বহুদলীয় গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যে মতাদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচিত হন অনেকসময়ই সেই সমস্ত জনপ্রতিনিধি তাঁর জনপ্রতিনিধিত্বের সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন অর্থাৎ তাঁকে যে সমস্ত ব্যক্তিরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থাকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলুষিত করে তোলেন ।

জনপ্রতিনিধিদের এই কার্যকলাপ চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর । এই ধরনের দলবদলের বিরুদ্ধে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব লোকসভায় আইন প্রণয়ন করেন এবং তা দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । আইনটি হল Anti Defection Law 1986 (দলত্যাগ বিরোধী আইন) । কিন্তু এই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের মনে আজ নানান প্রশ্ন । বিশেষ করে বিগত ৩০/৪০ বছর ধরে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে জনপ্রতিনিধিরা একটি দলের মতাদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচিত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থিত অন্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন এবং দেশের নির্বাচকমন্ডলী অর্থাৎ জনগণকে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় থাকতে হচ্ছে কেননা তাঁদের হাতে এমন কোন আইন নেই যে আইনের মাধ্যমে তিনি, যাঁকে যে মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচিত করেছিলেন তার বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । যে আইনটি বলবৎ আছে সেই Anti Defection Law 1986 এর কার্যকারিতা প্রায় শূন্যমার্গে । ফলতঃ লোকসভা থেকে আরম্ভ করে একেবারে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত

জনপ্রতিনিধি ক্রয় বিক্রয় এখন একটি বহু পরিচিত দৃশ্য। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে এক নতুন বাজার তৈরি হয় যে বাজারে সাংসদ, বিধায়ক সহ বিভিন্ন ধরনের জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের দল ছেড়ে অবলীলাক্রমে অন্যদলে যোগদান করে থাকেন। ফলে পতন ঘটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকারের। সংখ্যালঘু জনপ্রতিনিধিরা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার গঠন করেন যদিও ভোটের নিরিখে সেই দলের সরকার চালানোর কোনোরকম অধিকারই নেই।

গণতান্ত্রিক বহুদলীয় ব্যবস্থাতে ভোটের আগেই প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাঁদের মতাদর্শ, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নিজ নিজ ইস্তাহারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন এবং নাগরিকগণ সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে তাঁর মূল্যবান ভোটটি প্রদান করে ভারতীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল জনপ্রতিনিধিরা আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নির্বাচকমন্ডলীর সাথে ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন যার ফলে ভারতবর্ষের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ দুষ্টচক্রের মৃগয়াভূমি, যেখানে নৈতিকতার লেশমাত্র নেই।

এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদমর্যাদায় আসীন মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের আবেদন, নির্বাচিত সময়কালে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি দলবদল করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি কারণ প্রত্যেকটি স্তরে যথাক্রমে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের জন্য যে প্রশাসনিক আয়োজন হয় তা জনগণের দেয়া কর থেকে ব্যয় করা হয়। আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব -

১) নির্বাচিত সময়কালে কোন জনপ্রতিনিধি দলত্যাগ করলে তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রে নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য যে অর্থ নির্বাচন কমিশন ব্যয় করেছে সেই অর্থ দলত্যাগী ব্যক্তিকে বহন করতে হবে এবং তাঁর পদত্যাগের জন্য যদি নতুন করে নির্বাচন করতে হয় তবে যে অর্থ ব্যয় হবে সেই অর্থও তাঁকেই প্রদান করতে হবে। যদি তিনি এই অর্থ দিতে অসমর্থ হন তাহলে তিনি পরবর্তী ক্ষেত্রে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। আর যদি কোন দলের হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তাহলে সেই দলকে দলত্যাগী প্রতিনিধির বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দিতে হবে।

২) নির্বাচিত সময়কালে যদি কেউ অন্য দলে যান তাহলে সেই নির্বাচনী ক্ষেত্রের যে কোন ভোটারের অধিকার থাকবে দলত্যাগী প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের মামলা করার এবং দলত্যাগী প্রতিনিধিকে কোর্টে প্রমাণ করতে হবে যে দলত্যাগ করে তিনি কোনোরকম বিশ্বাসভঙ্গ করেননি। এই বিশ্বাসভঙ্গের মামলায় দলত্যাগী প্রতিনিধি পরাজিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা জরিমানা ও পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রযোয্য হওয়া উচিত।

সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে আস্থাশীল সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে আমাদের এই প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক
আইন সহায়তা কেন্দ্র

[সকল সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে]

চন্দননগর, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১